কিতাবঃ ঐতিহাসিক গদীর-ই-খোম এর ঘটনা
(ও শিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধারণা ও তার খন্ডন)
লেখকঃ আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
প্রকাশকঃ রেযা পাব্লিকেশন্স
সংগ্রহ: কাজী আজিজুল ইসলাম

==========================

بسم الله الرحمن الرحيم

ঐতিহাসিক বিদায় হজ্ব সমাপন করে আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর আকরাম (ﷺ) মদীনা তৈয়্যবায় পুনরায় তাশরীফ নিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে ‘গদীর-ই-খোম’ নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। এখানে হুযূর আকরাম (ﷺ) সাহাবা কেরামের উদ্দেশ্যে যেসব ঐতিহাসিক বরকতময় নসীহত করেছিলেন তন্মধ্যে আহলে ও বায়ত, বিশেষ করে, হযরত আলী (رضي الله عنه) সম্পর্কে কৃত বিশেষ নসীহত ছিলো অন্যতম। বস্তুতঃ এ নসীহত ছিলো হযরত আলী (رضي الله عنه)র বিশেষ মর্যাদার প্রতি সাহাবা কেরাম তথা বিশ্ববাসীকে সজাগ করা এবং তাঁর প্রতি ভালবাসাকে সর্বদা অটুট রাখার গুরুত্বকে বিশেষভাবে প্রকাশ করা, যেভাবে অন্যান্য স্থানে হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওসমান এবং অন্যান্য সাহাবা কেরাম (رضي الله عنه)-এর মর্যাদার কথা এরশাদ ফরমায়েছেন। তাছাড়া, ঐ নসীহতের পেছনে বিশেষ একটা প্রেক্ষাপটও রয়েছে। ঐ নসীহত নিঃসন্দেহে এ জন্যই ছিলোনা যে, হুযূর (ﷺ) হযরত আলী (رضي الله عنه)কে সেদিন ইমাম হিসেবে ঘোষণা করবেন। কারণ, যেই প্রেক্ষাপটে হুযূর (ﷺ) হযরত আলী (رضي الله عنه)-এর প্রতি সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন এবং যেই বরকতময় শব্দগুলো তিনি এরশাদ ফরমায়েছেন- তার কোনটাই হযরত আলী (رضي الله عنه)-কে ‘ইমাম’ বলে ঘোষণা করার অর্থ প্রকাশ পায়না। কিন্তু এতদ্সত্বেও মনগড়াভাবে, হঠকারিতা করে মহাভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় সেই ‘গদীর-ই-খোম’-এর ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এমন সব ভ্রান্ত আকীদা বা বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে, যেগুলোকে ইসলামের কোন মুহাদ্দিস বা ফক্বীহ্ কিংবা ইমামই গ্রহণ করেননি; বরং প্রত্যাখ্যানই করেছেন। কারণ, শিয়া সম্প্রদায়ের উক্ত অপব্যাখ্যা বস্তুতঃ ইসলামের মূলনীতিতে কুঠারাঘাত করেছে এবং ইসলামের ইস্পাত কঠিন ঐক্যে চির ধরিয়ে নতুন এক ভ্রান্ত (শিয়া) সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়ে তাদেরকে পথভ্রান্ত ও ঈমানহারা করার প্রয়াস পেয়েছে।

দুঃখের হলেও সত্য যে, বর্তমানে আমাদের দেশেও সেই ভ্রান্ত সম্প্রদায়টি (যারা বর্তমানে ইরানের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে শিয়া মতবাদ প্রচারে আদাজল খেয়ে লেগেছে) তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে এদেশেও ঐ ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচারের প্রয়াস চালাচ্ছে। এদেশের পত্র-পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে ঐসব বাঙ্গালী এজেন্ট শিয়াদের ষ্টাইলে ঐ ‘গদীর-ই-খোম’ দিবস পালন করে আসছে নির্লজ্জভাবে। একথা নিশ্চিত সত্য যে, তাদের এ নির্লজ্জতা, একদিন এদেশে শিয়া মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে, তাদের দুঃসাহসেই পরিণত হবে- যদি এদেশের সুন্নী মুসলমান তাদের ব্যাপারে কোনরূপ ঔদাসীন্য বা দুর্বলতা প্রদর্শন করেন।

সুতরাং আমি আমার এ পুস্তিকায় ঐতিহাসিক ‘গদীর-ই-খোম’-এর সঠিক ঘটনা তুলে ধরে সেটার আসল তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেলাম, যাতে একদিকে সুন্নী মুসলমানগণ আসল ব্যাপার জানতে ও বুঝতে পারেন, আর অন্যদিকে চিহ্নিত হয় শিয়া সম্প্রদায় ও তাদের দোসরদের আসল স্বরূপ।

ঘটনা

====

আঁ-হযরত (ﷺ) যখন বিদায় হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন পথিমধ্যে গদীর-ই-খোম'নামক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি করলেন। এটা মক্কা ও মদীনা শরীফের মধ্যভাগে জোহফার আশেপাশেই অবস্থিত।

এখান থেকে তিন মাইল দূরে ঐ 'গদীর' অবস্থিত। এখানে এসে হুযূর (ﷺ) সাহাবা কেরামের দিকে মনোনিবেশ করলেন। আর এরশাদ ফরমালেন-

السنم تعمون أني أولى بالمومنين؟

(তোমরা কি জাননা যে, আমি মুসলমানদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক নিকটে?) অন্য এক বর্ণনানুসারে, হুযূর (ﷺ) হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু'র হাত উপরের দিকে তুলে ধরে একথাটি তিন বার বলেছিলেন।

তদুত্তরে, সবাই বললেন- "হা, নিশ্চয় আপনি সমস্ত মুসলমানের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও নিকটে ও প্রিয়।"

অতঃপর এরশাদ ফরমালেন, "আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিষ রেখে যাচ্ছি তন্মধ্যে একটা অপরটা অপেক্ষা মহান। সে দুটি হচ্ছে- ১) কোরআন করীম এবং ২) আমার আহলে বায়ত (পরিবার-পরিজন)। আমার পর ঐ দু'টি সম্পর্কে এ মর্মে সতর্ক থাকবে যে, সে দু'টির সাথে কিরূপ আচরণ করছো? সেদুটির প্রতি তোমাদের কর্তব্য কিভাবে পালন করছো? আমি চলে যাবার পর এ দু'টির একটা অপরটা থেকে পৃথক হবেনা। শেষ পর্যন্ত তোমরা 'হাওয-ই-কাওসার'-এর কিনারায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।"

অতঃপর এরশাদ ফরমালেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমার মাওলা (مولي) আর আমি হলাম সমস্ত মুসলমানের মাওলা (مولي)।

اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه

.(হে আল্লাহ! আমি যার মাওলা' আলীও তার 'মাওলা'।)।

اللهم وال من والاه

(হে আল্লাহ্! তুমিও তাকেই ভালবাসো, যে আলীকে ভালবাসে।)

وعاد من عاداه

(এবং তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য করো, যে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে ।) অন্য বর্ণনায় এটাও এরশাদ হয়েছে-

وانصر من نصره واخذل من خذله

[হে আল্লাহ্! তাকে সাহায্য করো, যে তাঁকে (আলীকে) সাহায্য করে। আর তাকে অপমানিত করো, যে আলীকে ছেড়ে দেয়।] আর যেদিকে আলী মনোনিবেশ করে, সত্যকেও সেদিকে নিশ্চিত করো।"

এ ঘটনার পর সাহাবা কেরামের মধ্যে হযরত ওমর ফারূক (رضي الله عنه), হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সাথে সাক্ষাৎ হলে, তাঁকে মুবারকবাদ দিয়ে বললেন-

هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وامسيت مولى كل مؤمن و مؤمنة

অর্থাৎঃ "আবুতালিব-তনয়কে ধন্যবাদ! আপনার সকাল ও সন্ধ্যাতো এমতাবস্থায় হচ্ছে যে, আপনি প্রত্যেক মুমিন নরনারীর 'মাওলা'।"

এ হাদীসখানা ইমাম আহমদ হযরত বারা ইবনে আযিব এবং হযরত যায়দ ইবনে আরক্বাম (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন; যেমন- মিশকাত শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। (মাদারিজুননুবূয়ত ও আসাহহুস্ সিয়র ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।)

এখন দেখুন, এ হাদীসের প্রেক্ষাপট কি? মুহাদ্দেসীন কেরাম ও নির্ভরযোগ্য ইমামগণ এই হাদীসের মর্মার্থ কি বর্ণনা করেছেন? পক্ষান্তরে, ভ্রান্তশিয়া সম্প্রদায় কিভাবে এ হাদীসের অপব্যাখ্যা করে তাদের জঘন্য ভ্রান্ত আক্বীদার জন্ম দিয়েছে?

হাদীসের প্রেক্ষাপট

==========

'গদীর-ই-খোম'-এর খোৎবায় হুযুর (ﷺ) কর্তৃক বিশেষ করে হযরত আলী (رضي الله عنه) সম্পর্কে উক্ত হাদীস শরীফ এরশাদ করার প্রয়োজনীয়তাটা কি ছিলো? কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হুযুর (ﷺ) ঐ নসীহতটি করেছেন? এ প্রসঙ্গে ইনে হাজর মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার সাওয়াইক্বে মুহরিক্বাহ' নামক কিতাবে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন- হাফেয শামসুদ্দীন- হাফেজ শামসুদ্দনীন জাযারী ইবনে ইসহাক্ব থেকে বর্ণনা করেন- যেসব লোক হযরত আলী। (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে ইয়েমেন গিয়েছিলেন তাঁদের থেকে কেউ কেউ হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সহীহ বোখারী শরীফের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, হযরত বোরায়দা (رضي الله عنه) হযরত আলী (কাররামাল্লাহু)-এর কোন সিদ্ধান্তের কারণে তার সাথে বিরোধ করেন। এ বিরোধিতা পরবর্তীতে শত্রুতায় পরিণত হয়েছিলো। হুযূর (ﷺ) ওফাত শরীফের পূর্বে উক্ত খোৎবা বা ভাষণে সেটার খন্ডন করে ঐ শত্রুতার অবসান ঘটিয়েছিলেন। (কারণ, এর মাত্র দু'মাস পরই হুযূর আকরাম এ পৃথিবী থেকে পর্দা করে অন্তরালে তশরীফ নিয়ে যান।) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়াসাল্লাম। ইমাম যাহাবী হাদীসের উক্ত প্রেক্ষাপটই বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য পেশ করেন। কারণ, হযরত বোরায়দাহ্ রসূলে আকরামের সামনে অভিযোগ করলে হুযূরের চেহারা আনওয়ারের রং পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ হুযূর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে খোদ্ হযরত বোরায়দাহ্ বলছেন- হুযুর এরশাদ ফরমান-

يا بريدة الست اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ قلت بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلى مولاه

("হে বোরায়দাহ্! আমি কি মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও নিকটে নই?" আমি আরয করলাম, "হাঁ, হে আল্লাহর রসূল!" এরশাদ ফরমালেন,

“আমি যার মাওলা’ আলীও তার ‘মাওলা’।” আবু দাউদ সাজিস্তানী ও আবু হাতিম রাযী প্রমূখ এই বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আপত্তি করলেও ইবনে হাজর মক্কী লিখেছেন যে, ষোলজন সাহাবী এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর এক বর্ণনায়, ত্রিশজন সাহাবী এটা বর্ণনা করেছেন, “ আমি রসূল করীম (ﷺ)-কে তা এরশাদ করতে শুনেছি।”

মূলতঃ হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ্বহাহুর ফযীলতের পক্ষে এ ঘটনাটাকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এ বর্ণনাটা বিভিন্ন ‘সনদ’ (সূত্র) দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু কিছু হচ্ছে ‘সহীহ’ (বিশুদ্ধ) আর কিছু কিছু ‘হাসান’ (গ্রহণযোগ্য) পর্যায়ের। এ কারণে এ বর্ণনা নিঃসন্দেহে সহীহ। তবে এর হাদীসখানা (من كنت مولاه فعلى مولاه) অর্থাৎঃ আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা) খবর-ই-ওয়াহিদ’-(خبرواحد)এর ঊর্ধ্বে নয়। যেহেতু এ হাদীসের বিশুদ্ধতা নিয়ে হাদীসের কোন কোন ইমাম আপত্তিও উত্থাপন করেছেন, তবুও অন্যান্য সনদ সূত্রে তা বর্ণিত হয়েছে বিধায় সেটা বিশুদ্ধ হলেও মুতাওয়াতির’পর্যায়ের হতে পারেনা। যদিও শিয়ারা এ হাদীসকে ‘মুতাওয়াতির’ পর্যায়ের বলে প্রচার করে। বস্তুতঃ তাদের এ প্রচারণা ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। সর্বোপরি, এ প্রচারণা হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এর অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে এটাও প্রনিধানযোগ্য যে, ইমাম বোখারী ঐ ঘটনাটি বর্ণনাই করেননি। ইমাম মুসলিম অবশ্য তা বর্ণনা করেছেন; কিন্তু হুযুরের খোতবা বা ভাষণের যেই বচনগুলো তাতে এরশাদ হয়েছে (من كنت مولاه فعلى مولاه) সেগুলো দ্বারা শিয়াদের ঐ উদ্দেশ্য হাসিল হয়না, যা তারা করতে চায়; বরং তা দ্বারা হযরত আলী (رضي الله عنه)র ফযীলতই প্রকাশ পায় মাত্র।

হাদীসের উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ

=================

এ হাদীস শরীফ হযরত আলী (رضي الله عنه)র চূড়ান্ত কারামত ও ফযীলতকে প্রকাশ করে। এটা দ্বারা হুযুর (ﷺ) মুসলমানদেরকে হযরত আলী (رضي الله عنه)র সাথে ভালবাসা রাখার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। পক্ষান্তরে, তার প্রতি শত্রুতা পোষণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষাই তাতে দেয়া হয়েছে। যেমন অন্য একটা বর্ণনায় এসেছে, “হযরত আলীর সাথে শুধু ঐ ব্যক্তিই ভালবাসা রাখবে যে মু’মিন হবে। আর তার প্রতি শত্রুতা সে-ই পোষণ করতে পারে, যে মুনাফিক। তাছাড়া, হাদীসের ঐ প্রেক্ষাপটও একথাই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে। এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত অভিমত।

শিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধারণা

==================

কিন্তু সুন্নী মতাদর্শ থেকে বহু আগেই সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত ভ্রান্তশিয়া সম্প্রদায়টি উক্ত হাদীস ও ঘটনাকে এ মর্মে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাতে চায় যে, হযরত আলী (رضي الله عنه)ই ‘ইমাম’ এবং হুযূর (ﷺ)-এর অব্যবহিত পরেই তিনি খলীফা ইমাম”। তারা এটা দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারুক ((رضي الله عنه)) এর খিলাফতকে তথাকথিত অবৈধ বলে অপপ্রচার চালায়। নাউযুবিল্লাহ্!

উল্লেখ্য, শিয়ারা তাদের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলো উপস্থাপন করারও অপপ্রয়াস চালিয়ে থাকেঃ

এক) হাদীসটা নাকি ‘মুতাওয়াতির’ পর্যায়ের। (কারণ, শিয়াদের মতে, ইমামত’-এর বিষয়টা শুধু মুতাওয়াতির’ পর্যায়ের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হতে পারে ।)

দুই) তারা হুযূর পাকের এরশাদ- الست اولی بکم؟

(আমি কি । তোমাদের ‘মাওলা’ নই?)-এর أولی (আওলা) পদটি

এবং (من كنت مولاه فعلى مولاه) আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা)-এর مولی (মাওলা) পদটি থেকে ইমাম’ হবার অর্থ গ্রহণ করে হযরত আলী (رضي الله عنه)কেই একমাত্র ইমাম বা খলীফা বলে প্রমাণ করতে চায়।

জবাব

====

প্রথমতঃ শিয়াদের মতে “ইমাম’ সাব্যস্ত করার বিষয়টি ‘মুতাওয়াতির’ পর্যায়ের ‘রাওয়ায়ত’ (অর্থাৎ, এমন বর্ণনা, যার বর্ণনাকারী প্রতিটি যুগে এতবেশী যে, তাঁদের মিথ্যার উপর ঐকমত্য অসম্ভব। যার ফলে বর্ণনাটিও এতই বিশুদ্ধ যে, তা দ্বারা পবিত্র কোরআনের আয়াতকেও রহিত বলে ধরে নেয়া যায়। বস্তুতঃ গদীর-ই-খোমের ঘটনা বা বর্ণনাটি ঐ পর্যায়ের নয়; যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর শিয়ারা তাদের দাবীর সমর্থনে উক্ত বর্ণনাটিকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বলে যেই ঘোষণা দেয় তা নিছক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। যেখানে উক্ত বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কারো কারো আপত্তি রয়েছে, সেখানে সেটা মুতাওয়াতির হবে কোত্থেকে? বর্ণনার বিশুদ্ধতা ইমাম বোখারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর শর্তানুরূপ নয় বিধায় তিনি সেটা বর্ণনাই করেননি। ইমাম মুসলিমের বর্ণিত হাদীসের বচনগুলোর অর্থতো শিয়াদের গৃহীত অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীতই। তবুও হাদীস বিশুদ্ধ হলেও তা শিয়াদের আক্বীদানুসারে, ইমাম’ বানানোর পক্ষে দলীল হবার মতো নয়।

দ্বিতীয়তঃ مولي (মাওলা) শব্দটি একাধিক অর্থবোধক। যেমন ১) معتق (মু’তাক্ব), ২) عتيق (আতীক্ব), অর্থাৎ আযাদকৃত, ৩) نصر (নাসির বা সাহায্যকারী), ৪) محبوب (মাহবুব বা প্রিয়) এবং ৫) متصرف فی الامر (অর্থাৎ নিজ খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতায় নির্দেশদাতা বা নির্দেশ দেয়ার উপযোগী)। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোনটাই ‘ইমাম হওয়া কিংবা ‘খলিফা হওয়া’

(যথাক্রমে امامت ও خلافت)-এর অর্থ অনিবার্যরূপে প্রকাশ করেনা।

তৃতীয়তঃ হাঁ, কিছুক্ষণের জন্য যদি ‘ইমামত (ইমাম হওয়া) আনুগত্যের উপযোগী হওয়া’-এর অর্থ কল্পনাও করা হয়, তবুও তো তার এ অর্থ নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায়না যে, তাৎক্ষণিকভাবে, তখনই তিনি (হযরত আলী (رضي الله عنه)) মু'মিনদের খলীফা ছিলেন, এমনকি যখনই হুযূর তা এরশাদ ফরমাচ্ছিলেন। কারণ, তখনতো হুযূর আপন প্রকাশ্য হায়াতে মওজুদ ছিলেন। হ্যা, তখন অর্থ এই হতে পারে যে, তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণের পর তিনি “ইমামে হক্ব’ (যথার্থ সুর ইমাম) হবেন, যেমনটি তিনি যথাসময়ে হয়েছিলেন। কাজেই, এটাকে শায়খাঈন’ (হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারুক)-এর খিলাফত ও ইমামতের মোকাবেলায় হুযুর (ﷺ)-এর ওফাত শরীফের পরপরই বিরতি ছাড়াই হযরত আলী খলীফা হবার পক্ষে দলীলরূপে স্থির করা কোন মতেই শুদ্ধ হবেনা। (رضي الله عنه)।

চতুর্থতঃ আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে- শিয়ারা এই বর্ণনাকে এতই জোরেশোরে হযরত আলী (কারামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম)-এর ইমামতের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করায়, কিন্তু এটা দেখেনা যে, হুযূর আকরাম (ﷺ)-এর ওফাত শরীফের পর যখন খেলাফত' ও 'ইমামত'-এর বিষয় ও নিয়ে আলোচনা চলছিলো তখন না হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু) নিজেই ঐ বর্ণনাকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, না হযরত আব্বাস, না বনু হাশিম গোত্রের কেউ, না কোন একজন সাহাবীও।

বলা বাহুল্য, 'সক্বীফাহ্-ই-বনী সা'ইদাহ্' নামক স্থানে খেলাফতের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। শীর্ষস্থানীয় 'মুহাজেরীন' ও 'আসার' সাহাবীগণ তাতে অংশ গ্রহণ করেন। সর্বোপরি, তাতে ঐসব সাহাবীও শরীক হন, যাঁরা খোদ্ 'গদীর-ই-খোম'-এর 'খোতবা বা ভাষণের সময় উপস্থিত ছিলেন। ঐ খোৎবার পর সময়ও অতিবাহিত হয়েছিলো মাত্র দু'মাস। কিন্তু কেউ এ ঘটনা ও বর্ণনাকে ইমামতের দলীল হিসেবে পেশ করলেন না, বরং তারা সেটাকে হযরত আলী (رضي الله عنه)-এর ফযীলত নির্দেশক বলেই অভিহিত করেন।

পঞ্চমতঃ এ বর্ণনা সত্ত্বেও খোদ্ হযরত আলী (رضي الله عنه) বারংবার সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, হুযূর (ﷺ) কাউকেও ইমাম' বা 'খলীফা' নিয়োগ করেননি। কারো নামও ঐ পদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেননি। খেলাফতের বিষয়টি উপস্থিত সাহাবা কেরামের পরামর্শানুসারেই হয়েছে। এমর্মে অগণিত বর্ণনাই হযরত আলী কারামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহু থেকে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটা উল্লেখ করা গেলোঃ

ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, বাযযায 'হাসান পর্যায়ের 'সনদ' সহকারে, আর ইমাম আহমদ 'মজবুত' সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহু-এর নিকট লোকেরা তাঁকে। খলীফা বানানোর দাবী জানালেন। তিনি বলেন, "আল্লাহর রসূল যেভাবে ঐবিষয়টি তোমাদের মতামতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন আমরাও অনুরূপভাবে সেটা তোমাদের মতামতের উপর ছেড়ে দিলাম।"

বাযযায় থেকে এমন একটি বর্ণনাও পাওয়া যায়, যার বর্ণনাকারীগণ হলেন। বোখারী শরীফেরও বর্ণনাকারী। তাতে বর্ণিত হয় যে, হযরত আলী (رضي الله عنه) এরশাদ ফরমান, "আল্লাহর রসূল কাউকেও খলীফা নিয়োগ করেননি।"

দারুকুতনী, ইবনে আসাকির এবং ইমাম যাহাবী প্রমুখ হযরত আলী , কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বসরা নগরীতে বর্ণনাটি করেছেন, "আল্লাহরই শপথ! আল্লাহর রসূল আমাদের জন্য কারো খিলাফতের ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ করেননি। যদি রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) অঙ্গীকার নিতেন তবে আমরা (তাকে বাদ। দিয়ে) আমাদের ভাই বনী তাইয়্যেম ইবনে মুররাহকে এবং ওমর ইবনুল খাত্তাবকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মিম্বর শরীফের উপর প্রতিনিধিত্ব (খিলাফত) করতে দিতামনা এবং (তারা যদি বিরোধিতা করতেন, তবে) আমাদের এই হাতে তাঁদের সাথে মোকাবেলা করতাম।"

আবু নঈম বর্ণনা করেন- হযরত হাসান-আল-মুসান্নাকে জিজ্ঞাসা করা হলো- (من كنت مولاه فعلى مولاه) (আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা) হযরত আলী (رضي الله عنه))-এর ইমামতের প্রমাণ কিনা! তিনি বলেন, "আল্লাহর শপথ! যদি 'মাওলা' শব্দ দ্বারা রসূলুল্লাহর উদ্দেশ্য আমীর' কিংবা 'সুলতান' (খলীফা) বানানোই হতো, তবে তিনি ((ﷺ)) তদপেক্ষা সুস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দই ব্যবহার করতেন। কারণ, হুযূর (ﷺ) ছিলেন فصيح البيان (অলংকার সমৃদ্ধ সুস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দ প্রয়োগকারী)।

আর যদি ইমামতের জন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও হযরত আলী কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহুকে নিয়োগ করে দিতেন, আর হযরত আলী (কাররামাল্লাহু)ও ঐ সম্পর্কে জানা সত্বেও নীরব থাকতেন এবং রসূলুল্লাহর নির্দেশ বর্জিত হতে দেখে তাতে প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকতেন, তবে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহগার হযরত আলী (কারামাল্লাহু)-ই হতেন; নতুবা তাতে তাঁর কাপুরুষত্বই প্রমাণিত হতো। (নাউযুবিল্লাহ্।) এটাতো কোন অবস্থাতেই হতে পারেনা।"

মোটকথা, উপরোক্ত বর্ণনা (রেওয়ায়ত) থেকে হযরত আলীকে ইমাম নিযুক্ত করার অর্থ গ্রহণ করা এবং সেটাকে এ মর্মে দলীল হিসেবে পেশ করা কোন মতেই বিশুদ্ধ নয়। তা না আভিধানিকভাবে শুদ্ধ, না ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশুদ্ধ। যদি এটা শুদ্ধ হতো তবে সেটার পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে দেখে সাহাবা কেরাম অবশ্যই আপত্তি উত্থাপন করতেন এবং তাঁরা ঐ বিশুদ্ধ অর্থই তা থেকে গ্রহণ করতেন ও সেটাকে প্রমাণ হিসেবে স্থির করতেন। অবশ্যই এটা করতেন- বনী হাশেম ও হযরত আলী নিজেই। আরো করতেন- হযরত আব্বাস। কিন্তু কেউতো তা করেননি। আর তাও এমনই মুহূর্তে করেননি যা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন ছিলো। ((رضي الله عنه)ম) ।

অতএব, মাওলা' (مولى) শব্দের অর্থ এখানে সাহায্যকারী' ও 'প্রিয়। বাস্তবিকপক্ষে, এই অর্থ গ্রহণ করলে কোন প্রকার অসুবিধারই সম্মুখীন হতে হয়না। (আস্সাওয়াইকুল মুহরিকাহ, মাদারিজুন্নবুয়ত ও আসাহহুসিয়ার ইত্যাদি)।

সুতরাং শিয়া সম্প্রদায় ও তাদের এজেন্টদেরকে এ প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাতের এই বিশুদ্ধ অভিমতকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে তাদের চরম ভ্রান্তি থেকে বিরত হবার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। চরম ভ্রান্তি' এ জন্য বললাম যে, তারা 'গদীর ই-খোম'-এর উপরোক্ত ভাষণ থেকে মনগড়া অর্থ গ্রহণ করে কিংবা অপব্যাখ্যা দিয়ে হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে হুযূর (ﷺ)-এর পরপরই যে শুধু ইমাম বলে বিশ্বাস করেনা, বরং তারা আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সেই 'ইমামত'-কে নবী করীম (ﷺ)-এর নবুয়ত ও রিসালাত অপেক্ষাও উত্তম বলার মতো কুফরী মতবাদ সৃষ্টি করে নিয়েছে। এমনকি তাদের কোন কোন বই-পুস্তকে তাই হুযূর (ﷺ)-এর উপরও সেই 'ইমামত'-কে মেনে নেয়া জরুরী ছিলো বলে নির্ভেজাল কুফরী আক্বীদা প্রচার করার ঘৃণ্য প্রয়াস চালায়।

ইমামত ও ইমাম সম্পর্কে শিয়াদের ভ্রান্তদৃষ্টিভঙ্গী।

==============================

এখানে উল্লেখ্য যে, ক্ষেত্র বিশেষে আহলে সুন্নাতও 'ইমাম' এর 'ইমামত' শব্দগুলো ব্যবহার করে থাকেন। তারা অবশ্য এগুলো এ অর্থে ব্যবহার করেন যে, 'ইমাম' হলেন ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। আর ইমামত হচ্ছে ইমামের বিশেষ যোগ্যতা বা পদবী। ধর্মীয় বিষয়াদিতে অগাধ দক্ষতা ও পান্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ ও তার রসূল এবং সাহাবা কেরামের নির্দেশিত পথের দিশারী হন এবং ধর্মীয় জটিল বিষয়াদির সমাধান দিতে যিনি সক্ষম হন। তাঁকেই আহলে সুন্নাতের পরিভাষায় ইমাম বলে। এহেন অর্থের ভিত্তিতে ইমাম' শব্দটি আপন অর্থে যথার্থ। এটা 'নবী', 'সাহাবী অথবা খলীফা কোনটার মর্যাদার সাথে আদর্শগতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা বা বিরোধপূর্ণ নয়, তাই সেটার ব্যবহার এ অর্থে আপত্তিকরও নয়।

কিন্তু 'ইমামত' বা 'ইমাম' শব্দ দু'টু নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করতে গিয়ে শিয়ারা ও সুন্নী মতাদর্শের গন্ডী থেকে বেরিয়ে বহুদূরে এক মারাত্মক ভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থান নিয়েছে। তাই, ইমামত সম্পর্কে শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গী নিম্নে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেলামঃ

ইমামত সম্পর্কে তাদের মনগড়া ও ভ্রান্ত আক্বীদা বা বিশ্বাসকে শিয়া ধর্মের ও মৌলিক বিষয় বলা যায়। তাদের মতে, যেভাবে আল্লাহ তরফ থেকে নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) প্রেরিত হতেন, অনুরূপভাবে- হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আল আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর ইমামদেরকেও নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়। আর শিয়াদের আক্বীদা বা ধর্ম বিশ্বাসানুসারে, ঐ ইমামগণও নাকি শরীয়তের বিধি-বিধান প্রবর্তন করতে পারেন। সর্বোপরি, তারা নাকি কোরআন করীমেরও যেকোন নির্দেশকে তাদের ইচ্ছানুসারে রহিত কিংবা অকার্যকর করতে পারেন। (নাউযুবিল্লাহ!) মোটকথা, শিয়াদের মতে, ইসলামী আক্বীদায় যেই অর্থ, যেই গুরুত্ব ও মর্যাদা একজন স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত প্রবর্তক নবী ও রসূলের রয়েছে, একই অর্থ, তাৎপর্য ও মর্যাদা তাদের 'ইমামে মাসূম' (নিস্পাপ ইমাম)-এরও রয়েছে। (সুম্মা নাউযুবিল্লাহ!)।

বলাবাহুল্য যে, এ অর্থেই শিয়ারা হযরত আলী (رضي الله عنه) ও তাঁর বংশধরগণকে 'ইমাম' বলে থাকে, যা সম্পূর্ণ অনৈসলামিক ও কুফরী আক্বীদা বৈ আর কিছুই নয়। আরো উল্লেখ থাকে যে, শিয়ারা এমনি বাতিল ও ঈমান বিধ্বংসী 'আক্বীদা'র (!) জন্ম দিয়েছে 'গদীর-ই-খোম'-এর ঘটনার অপব্যাখ্যা দিয়ে। শিয়াদের সাথে সুর মিলিয়ে যারা এদেশে ঐ দিবসটি উদযাপন করে তারা কোন্ জাতের মুসলমান? এতে তাদের মতলবই বা কি তা অবশ্যই ভাববার বিষয়।

পর্যালোচনা

========

এখন শিয়াদের এ দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করা যাকঃ

প্রথমতঃ শিয়াদের 'ইমামত' বিষয়ক উক্ত দৃষ্টিভঙ্গী হুযুর (ﷺ)-এর 'খতমে নবুয়ত' (শেষ নবী হওয়ার মহা মর্যাদা)-এর বিরুদ্ধে এক জঘন্য বিদ্রোহ, এবং ইসলামের স্থায়িত্বের বিরুদ্ধে এক সুস্পষ্ট ষড়যন্ত্র। কারণ, পুরানা যুগ থেকে আরম্ভ করে ভন্ডনবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী পর্যন্ত যেসব লোক 'নবী' ও 'রসূল' হবার মিথ্যা দাবীদার সেজেছে সবাই তাদের দাবীর মাল-মসল্লা শিয়াদেরই ঐ 'ইমাম বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী' থেকেই ধার নিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ শিয়া ধর্মের 'ইমামত বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি' স্বাভাবিক কারণে ভুল ছিলো। কারণ, এর অশুভ পরিণতির বোঝা খোদ্ শিয়া ধর্মও বেশী দিন বহন করতে পারেনি; বরং তারা তাদের ইমামগণের 'সিলসিলা' (পরম্পরা) দ্বাদশ ইমাম' পর্যন্ত অব্যাহত রেখে তাকে (২৬০ হিঃ সনে) কোন অজানা গুহায় (সুরা মানরাআ নামক গুহায়) স্থায়ীভাবে গোপন করে দিয়েছে। আজ পর্যন্ত সাড়ে এগার শতাব্দি গত হচ্ছে, কিন্তু তাদের কেউ জানেনা যে, তাদের সেই দ্বাদশ ইমাম কোথায় রয়েছে এবং কোন্ অবস্থায় আছে? বর্তমানে অবশ্য তাঁর নেতৃত্বের জন্য 'মাসুম ইমামের বৈশিষ্ট্যাবলীর ধারক 'বেলায়ত-ই-ফকীহ'-এর নতন পদ সষ্টি করে নেয়া হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে তথাকথিত ফকীহ' ও 'মুজতাহিদই' শিয়া এ সম্প্রদায়ের এমন আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী নেতা বিবেচিত হচ্ছে এবং তার নির্দেশ পালন করা গোটা শিয়া জমা'আতের উপর অপরিহার্য বলে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

তৃতীয়তঃ শিয়াদের ইমামত বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, এই ভ্রান্ত আক্বীদাটি ইসলামের আদি শত্রু ইহুদীরাই হুযূর (ﷺ)-এর 'খতমে নবুয়ত'-এর উপর আঘাত হানার জন্য এবং উম্মতের মধ্যে নবুয়ত ও ইমামতের মিথ্যা দাবীদারদের জন্য চোরাপথ আবিস্কারের উদ্দেশ্যেই গড়ে দিয়ে শিয়াদের মধ্যে সরবরাহ করেছে।

গভীরভাবে চিন্তার বিষয় হচ্ছে- হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম থেকে আরম্ভ করে হুযুর (ﷺ) পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় শতাব্দিকাল অতিবাহিত হয়েছে; অথচ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন পথপ্রদর্শক প্রেরিত হয়নি। কিন্তু এদিকে যখন খোদ্ 'খতমে নবুয়তের সূর্য' (হুযূর আকরাম (ﷺ)) উদিত হয়ে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য সমগ্র দুনিয়াকে আলোকিত করে প্রকাশ্য দুনিয়া থেকে পর্দা করার পর, শিয়াদের আকীদানুসারে, খোদা তা'আলা একদিনতো দূরের কথা, একটা মুহূর্তও নাকি অপেক্ষা করেননি, বরং তাৎক্ষণিকভাবে একজন তথাকথিত 'ইমামে মাসূম' দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন! তাও আবার এভাবেই যে, তাকে নাকি শরীয়তে মুহাম্মদীয়া'র হালাল ও হারামকে পরিবর্তিত করার, এমনকি কোরআনকেও লাগাতারভাবে রহিত করার ক্ষমতা প্রদান করছেন! শিয়া সম্প্রদায়ের আক্বীদানুসারে, যখন ইসলামের মাত্র আড়াই শতাব্দির গৌরবময় সময় অতিবাহিত হলো তখনই নাকি খোদা তা'আলা হঠাৎ করে ইমামদের' সিলসিলাও বন্ধ করে দিয়েছেন! বরং দ্বাদশ ইমাম, যাকে প্রেরণ করা হয়েছিলো, তাকেও নাকি মাত্র দু'বছর বয়সে স্থায়ীভাবে অদৃশ্য করে দিয়েছেন!

সুতরাং একজন মুসলমান, যে মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর নবুয়ত ও রিসালতের উপর ঈমান রাখে, যার বিশ্বাস হচ্ছে ইসলাম নিশ্চিহ্ন কিংবা পরিবর্তিত বা বিকৃত হবার জন্য আসেনি, বরং কিয়ামত পর্যন্ত তার আসল অবয়বে স্থায়ী ও উজ্জ্বল থাকার জন্যই এসেছে, সে কি শিয়াদের 'ইমামত সম্পর্কিত ঐ দৃষ্টিভঙ্গীকে একটা মাত্র মুহূর্তের জন্যও বরদাশত করতে পারবে? কক্ষনো না।

চতুর্থতঃ শিয়া ধর্মাবলম্বীগণ যেসব বুযর্গকে 'ইমামে মাসূম' বলে আখ্যায়িত করে থাকে, ঐ সব বুযর্গ না কখনো ঐ ধরণের ইমামতের দাবী করেছেন, না তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে তাঁদের ঐ ধরণের আনুগত্যের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন; বরং তাঁরা সবাই আহলে সুন্নাতেরই শীর্ষস্থানীয় বুযর্গ ও মুসলমানদের চোখের জ্যোতিই ছিলেন। তাঁদের দ্বীন-ধর্ম, তাদের কর্ম-পদ্ধতি এবং তাঁদের ইবাদত বন্দেগী কখনো শিয়াদের তথাকথিত 'উসূল ও আক্বাইদ'-এর মতো ছিলোনা; বরং তারা ছিলেন- সাহাবা কেরাম ও সম্মানিত তাবেঈনেরই অনুসৃত পথে। এ দ্বীন, যা আঁ হযরত (ﷺ) রেখে গেছেন, যা অনুসারে সমগ্র দুনিয়ার সত্যপন্থী মুসলমান কাজ করছেন, ঐ সব বুযর্গও সমগ্র দুনিয়ার সামনে তদনুযায়ীই কাজ করতেন।

কিন্তু শিয়া ধর্মাবলম্বীরা বলতে চাচ্ছে যে, ভিতরে ভিতরে তাঁদের আক্বীদা নাকি অন্যরূপ ছিলো, কিন্তু তাক্বিয়্যাহ্ (অর্থাৎ লোক ভয়ে নিজের আসল আক্বীদাকে ই গোপন করে বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের মতো কাজ) করে যেতেন।

চিন্তা করুন! শিয়াদের মতে, আল্লাহ্ তা'আলা কি এমনই কতগুলো লোককে ইমামে মাসূম' করে প্রেরণ করেছেন, যারা দুনিয়াকে কোন হিদায়ত দিতে পারেননি, বরং গোটা জীবনই তাকিয়্যার' নেক্বাব পড়েই চলে গেছেন? আর তাদের দ্বাদশ ইমাম তো এমনইভাবে গায়েব হয়ে গেলেন, যার আজ পর্যন্ত কোন হদীসই পাওয়া গেলোনা। (নাউযুবিল্লাহ)

সুতরাং এথেকে একথাই সুস্পষ্ট হলো যে, শিয়াদের ইমামত' সম্পর্কিত বাতিল দৃষ্টিভঙ্গী শুধু আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর আকরাম (ﷺ)-এর রিসালত ও নবুয়তের বিরুদ্ধে হামলা নয়, বরং এটা সরাসরি বিবেকেরও বিরোধী। সেটা আল্লাহর শিক্ষা নয়, বরং ইহুদী চক্রের কুবুদ্ধিরই আবিস্কার। সুতরাং যারা শিয়া নেতা খোমেনী'কে শিয়াদের সুরে ইমাম বলে আখ্যা দেয়, তার প্রতি বিভিন্নভাবে সম্মান দেখায়, তার মৃত্যুতে গায়েবী জানাযা পড়ে- তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে যে, শিয়ারা কোন অর্থ বা দৃষ্টিভঙ্গীতে তাকে ইমাম বলে? সুতরাং যারা শিয়া নেতাদেরকে ইমাম ইত্যাদি বলে সম্মান দেখায় তাদের পক্ষে সুন্নী হওয়াতো দূরের কথা, শেষ নবী হুযুর আকরাম (ﷺ)-এর উম্মত (মুসলমান) বলেও দাবী করার কোন যুক্তি থাকেনা।

নিছক ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে গদীর-ই-খোম'-এর খোতবার দিনটিকে শিয়ারা হযরত আলীর (رضي الله عنه) এবং শিয়াদের মহান সৌভাগ্যের দিন হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং মনগড়া ভাবে নানা বিনোদন মূলক আয়োজনের মাধ্যমে দিনটিকে উদযাপন করে থাকে। ঐ বিনোদনের ধরণগুলোর মধ্যে অতি গর্হিত । এ কর্মসূচীও থাকে বলে তাদের বিভিন্ন বই পুস্তক ও প্রচার পত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'মাত'আহ্' (বা সাময়িক বিবাহরূপী যিনা) বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

আরো উল্লেখ থাকে যে, 'গদীর দিবস'টি একমাত্র শিয়া সম্প্রদায়ই উদযাপন করে থাকে। দুঃখের হলেও সত্য যে, বিগত কয়েক বছর যাবৎ আমাদের দেশেও কতিপয় সুন্নী লেবেলপোশ ও সৈয়দ নামধারী লোক সেই 'গদীর- দিবসটি উদ্যাপন করে আসতে দেখা যাচ্ছে।

বস্তুতঃ যারা 'গদীর দিবস'টি এভাবে উদ্যাপন করে তারা সুন্নীও নয়, সৈয়দ কিংবা সত্যের অনুসারীও নয়। তারা আসলে শিয়াদের দালাল বা এজেন্ট অথবা মনে প্রাণে শিয়া মতবাদ গ্রহণ করে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে।

তাই, এমনসব ভ্রান্তলোকের সন্ধান পেতেই তাদের ব্যাপারে নিজেদের যেমন ই সতর্ক হওয়া দরকার, তেমনি অন্যান্যদেরকেও সতর্ক করার কর্তব্য পালনে ব্রতী হওয়াও আবশ্যক।

আল্লাহ্ পাক তৌফিক দিন! আমীন।

وما علينا الا البلاغ المبين